খলিল জিবরান : স্বপ্নদ্রষ্টা মেঘ

মানবেন্দু রায়

Forget not that I Shall come Back to you.
A little while my longing shall gather dust and foam from another body.
A little while, a moment of rest upon the wind, and another woman shall bear me.

-Prophet/ Khalil Gibran

তাঁর জন্ম ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি, আর মৃত্যু ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ১০ এপ্রিলের এক নির্জন শোকাবহ বিধুর সন্ধ্যায়। অর্ধশতকও পার করতে পারেননি জীবনবৃত্তকে, মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর অর্জনে তিরিশটির বেশী গ্রন্থ আর নিজের আঁকা অসংখ্য ছবি। সে সব ছবি দেখলে আরেকজন কবি ও চিত্রীর কথা মনে পড়ে যায় বড় বেশি, উইলিয়াম ব্লেক। যে ইংরাজ - কবি তাঁর সৃষ্টির আবহে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন মর্তসীমার পরিধি চূর্ণ করে অমরালোকের মরমী - নীলিমা। লেবাননেন স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষটিও —তাঁর রচনা গভীরে নিহিত ব্যঞ্জনায় পার্থিব জগতের ধূলি - মলিন বাস্তবতাকে প্রত্যাহত করতে চেয়েছেন জীবন - দেবতার প্রতি নিবিড় ভালোবাসায়, আত্মগত সমর্পণের অবিনশ্বর বিশ্বাসে। যে বিশ্বাস শতশোকের আঘাতে লুপ্ত হয় না, শিকড় ছিড়ে যায় না প্রাত্যহিকতায়, বেদনায় কশার আঘাতে। যে বিশ্বাস - জীবনের গভীরে থেকে যায় মানসিক সংবৃত্তির প্রতি আবহমানের উত্তরাধিকারের উজ্জ্বল দায়বোধ।

নিউউয়র্কে তাঁর স্টুডিও এবং বাসগৃহে এসেছেন প্রাচ্যের সন্ত - প্রতিম কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথকে সামনে বসিয়ে তাঁর একটি প্রতিকৃতি তিনি অঙ্কন করেন, এমন তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে। আধ্যাত্মভাবনার গভীরে রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও আমৃত্যু অনুভব করতে চেয়েছেন 'সীমার' সংকীর্ণ রেখার মধ্যেও 'অসীমের' পরিব্যাপ্তিকে, বিশ্বময় প্রসারিত মানব-বোধের চিরজাগ্রত, অপরাহত আত্মশক্তিকে। তাঁর মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করি, একক ব্যক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন একাধিক ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপ— কবি, চিত্রকর, গদ্যকার এই পরিচয়ের বাইরে তাঁর আরও সুতীব্র ব্যক্তি - মহিমা রচিত হয়, চিন্তাবিদ এবং রহস্যবাদী দার্শনিক রূপে। তাঁর লেখায় যে দর্শন প্রতিফলিত সেখানে একসূত্রে মিলেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। খৃষ্টিয় অনুভাব, ইসলাম - চেতনা, বৌদ্ধ -ক্ষণবাদ এবং উপনিষদের দর্শন জগত —সমস্ত অভিব্যক্তি সমূহকে তিনি তাঁর অনুভবের বিষয় করেছেন সাবলিল ভাবনার নির্মাণে। তবু তিনি বর্তমান বাংলা - সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে একজন প্রায় - অপরিচিত দূরের মানুষ। 'প্রফেট' গ্রন্থটি ছাড়া বাঙালি পাঠক তাঁর সম্বন্ধে বেশি কিছু খোঁজ রাখেন না। তাও সেই দুর্মর পাঠকদের সংখ্যা খুব নগণ্য। যাঁরা বাংলা - সাহিত্য রচনা করেছেন তাঁরাও, জীবন - দেবতার প্রতি আত্মনিবেদিত প্রেমিক স্রষ্টাকে তেমন গভীরভাবে চেনেন না। এমন কী যে রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে এখনও বাংলা সাহিত্যের মূলধারায় বহুব্যাপ্ত আলোচনা প্রবাহ, গবেষণা উদ্যোগ, সেখানেও এই মরমী স্রষ্টার তেমন কোন উল্লেখ নেই—তুলনামূলক আলোচনা তো দূরের কথা। (এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় বাঙালি রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্র খলিল জিবরানের কিছু রচনার অনুবাদ করে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।)

অথচ বিদেশের স্রষ্টা এবং ব্যক্তিত্ব, যাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোন না কোনে ভাবে সম্পর্ক সূত্র রচিত হয়েছিল, যাঁদের সৃজন প্রক্রিয়ায় এই ভারতীয় কবির চেতনালোকে আলোর স্পর্শ জেগে উঠেছিল, সে সম্পর্কে ইতিমধ্যে বেশ কিছু গবেষণাধর্মী লেখা রচিত হলেও — সে সব আলোচনায়, সমকালীন এই লেবানিজ দার্শনিক -কবির কোন প্রসঙ্গ উঠে আসেনি। এমন কী যাঁরা সারাজীবন রবীন্দ্রনাথকে জড়িয়ে বেঁচেছিলেন এবং বেঁচে আছেন, রবীন্দ্রনাথ যাঁদের জীবনে অনিবার্য নিঃশ্বাসের মতো, তাঁরাও রবীন্দ্র সমকালের এই বহুপঠিত স্রষ্টা সম্পর্কে নীরব উদাসীন। অথচ খলিল জিবরানের সঙ্গে, তাঁর সৃষ্টি সম্পদের সঙ্গে ভারতীয়দের বিশেষত বাংলাভাষীদেরও আরও বেশি পরিচয় নিবিড় হওয়া দরকার ছিল। সেই অপরিচয়ের সংকীর্ণ বেড়াটিকে সরিয়ে দেওয়ার সামান্য চেষ্টা এই রচনাটির মূল অনুভব।

কবি-চিত্রকার -দার্শনিক খলিল জিবরানের সৃজন কর্মের বহুস্তরীয় বিন্যাস একটি সামান্য গদ্য রচনার মধ্যে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সমকালীন ভাবজগতে তাঁর লেখার যে সর্বগ্রাসী প্রভাব, বিশেষত দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ-দীর্ণ ইউরোপীয় পাঠকদের কাছে জিবরানের মরমী রচনাবলীর অসামান্য আবেদন এখনও সমান সক্রিয়। ভারতবর্ষেও ইংরেজি ভাষায় জিবরানের রচনাবলির খোঁজ খুব সহজে যে কোন উদ্যমী পাঠক পেতে পারেন। এখনও মুগ্ধ হতে পারেন এই দুর্মর - স্রষ্টার চিরায়ত ভাবনাস্রোতের অমলিন আশ্চর্য অনুগাতে। জিবরানের রচনার ভাবসম্পদ আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে জীবনকে দেখার, অনুভব করার এক বহুতলবিশিষ্ট মায়ামুকুর বলে মনে হয়। নির্জন মানুষের সঙ্গহীনতার অভিশাপকে চূর্ণ করতে চেয়েছেন জিবরান— আজ সর্বগ্রাসী শূন্যতার যুগে তাই তাঁকে চিনে নেওয়া, খোঁজা এবং বুঝে নেওয়া, বর্তমান ভাবুকদের কাছে প্রাথমিক কর্তব্যের মতো। বিশেষত সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে গভীরবাবে জড়িয়ে ব্যক্তিরা, যাঁরা আজও রবীন্দ্রনাথকে, তাঁর রচনাবলিকে সমাজজীবনের একটি অমিবার্য দ্যোতক বলে মনে করেন, জিবরানের রচনার প্রতি মনোযোগ দেওয়া তাঁদের কাছে সবিশেষ প্রয়োজনীয়।

।। এক ।।

খালিল জিবরানের জীবন এবং সৃষ্টির অবস্থাটি বুঝতে হলে, তাঁর নিজস্ব দেশকালের সঙ্গে আর্থ - সমাজিক বাতাবরণের প্রেক্ষিতকে মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন। সেই সাথে গোষ্ঠীগত অধ্যাত্মচেতনার যে প্রতীতি তাকেও বিশ্লেষণ করা জরুরি। জিবরানের জন্ম উত্তর লেবাননের পার্বত্য এলাকায়, সীডার বৃক্ষের নির্জন ছায়াছন্নতায় আবৃত ছোট্টগ্রাম বি সারিতে, এক ম্যারোনাইট - খৃস্টান পরিবারে।

বৃহৎ সিরিয়া বলতে একসময় বোঝানো হত তিনটি প্রদেশকে - যেগুলির ভাষা - জাতি এবং ধর্মভিত্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সিরিয়া, লেবানন এবং প্যালেস্তাইন এই তিনটি দেশ নিয়ে চিহ্নিত হোত গ্রেটার সিরিয়ার ভৌগোলিকত্ব। লেবাবনন ছিল সেই বৃহৎ দেশের একটি ছিন্ন তুর্কী প্রদেশ — যা দীর্ঘকাল অটোমান সাম্রাজ্যের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু লেবাননেনের পার্বত্য অঞ্চল ছিল স্বশাসনের আওতায়। পার্বত্য লেবাননেন জনগণ অটোমান শাসকদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সময়কাল সংগ্রাম চালিয়েছেন। পরবর্তীকালে যে আগুনের - বীজ জিবরানকেও উদ্দীপ্ত, প্রতিবাদী হয়ে উঠতে প্রাণ শক্তি জুগিয়েছিল।

আসলে পার্বত্য- লেবানন অঞ্চলটি হয়ে উঠেছিল দীর্ঘকালের এক সামাজিক বিশৃঙ্খলার শিকার। তারও প্রধান কারণ এর জনগোষ্ঠী— যারা ভিন্ন ভাষা এবং আচারে বহুধা বিভক্ত। পরদেশি পরিযায়ী শ্রেণির মানুষের সংখ্যাও এই অশান্তির চারাগাছটিকে জল ও বাতাস দিয়ে পুষ্ট করেছিল। ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে খৃস্টান সম্প্রদায়, বিশেষত তাদের মেরোনাইট শাখা এবং মুসলমান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি ভিন্নতার তথা বিচ্ছিন্নতার পটভূমি স্পষ্ট ক্রিয়াশীল ছিল। এমন এক দ্বন্দ্বজারিত অস্থির ভূখণ্ডে খলিল জিবরান তাঁর জীবনের প্রথম পর্ব অতিবাহিত করেন। এ প্রসঙ্গে মেরোনাইট শাখা সম্পর্কে কিছু তথ্য জনা জরুরি। গত পঞ্চম শতকে বাইজানটাইন চার্চের নিয়ন্ত্রণে, সিরিয়ান খৃস্টানদের একটি গোষ্ঠী মেরোনাইট শাখা গড়ে তোলে। এই গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিলেন খৃষ্টিয় সাধুপুরুষ সেন্ট মারুন। যিনি মেরোনইটদের আধ্যত্মভাবনার প্রেক্ষাপটটিকে তাঁর নেতৃত্বগুণের একটি স্পষ্ট চেহারা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

জন্মসূত্রে জিবরান রক্তে বহন করেছেন সুপ্রাচীন ফিনিশীয় সভ্যতার ঐতিহ্যের প্রাণবীজ। যে ঐতিহ্য - চেতনা সংগঠিত করেছেন লেবানন পর্বত সন্নিহিত সীডার অরণ্যানীয় সবুজ ছায়াঘন অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, খৃষ্ট ভাবনার মরমী - ধারার আবহমানতা এবং অটোমান সাম্রাজ্যের বজ্রকঠিন শাসননীতির বিরুদ্ধে উৎসারিত প্রতিবাদ। ফিনিশীয় সভ্যতার প্রাচীনতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস - চেতনা, যে ঐতিহাসিকতা ভুলতে দেয় না, কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া ‘টায়ার’, ‘সারদা’, ‘বিবলোস্’ প্রভৃতি নগরের অতীতের আশ্চর্য বিস্তারকে। জিবরানের রচনার গভীর ব্যঞ্জনা, নিঃসঙ্গতা, নাটকীয়তা এবং প্রতীকি অবয়ব সমস্ত কিছুর নেপথ্যে রয়েছে পার্বত্য লেবাননের প্রকৃতির নির্জন - নৈঃশব্দ আর মরমী - অধ্যাত্মচেতনার নিবিড় সংশ্লেষ।

পরবর্তীকালে যা আমরা বারবার দেখতে পাবো—ধর্মীয় গোঁড়ামি, অচলায়তনিক ভাবধারা, প্রথানুগত্যর বিরুদ্ধে আপোষহীন এক প্রতিবাদী, বিদ্রোহী - স্রষ্টাকে। শৃঙ্খলিত মানব সত্তার কাছে আমৃত্যুকাল যিনি উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করেছেন — শিকল ভেঙে চুরমার করে স্থিতাবস্থার কারাগার থেকে বেরিয়ে আসতে। অন্ধকার গুহাগর্ভ থেকে যুক্তির আলোয় বেরিয়ে এসে ‘আত্মার মুক্তি’ খুঁজে নিতে। মানুষকে তিনি সব সময় খুঁজতে চেয়েছেন প্রথার বাইরে, আনুগত্যের বাইরে, অন্ধবিশ্বাসের বাইরে। যে মানুষ দলচ্যুত কিন্তু প্রবাহচ্যুত নয়। সমাজ যাকে প্রত্যাখান করেছেন, অথচ যে নিজেই অনড়- সমাজ-শিলার জড়তা চুর্ণ করে গড়ে তুলেছে এক শৃঙ্খলহীন, বন্ধনহীন, আনুগত্যহীন মানব প্রজাতির আনন্দঘন স্বতন্ত্র পৃথিবীলোক।

যাদের সমকালীন প্রবাহ কখনো ‘ভবঘুরে’— কখনো ‘উন্মাদ’ শিরোপায় চিহ্নিত করে। জনসমাজ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে ‘একা’ করে দিতে চায়। জিবরান সারাজীবন ধরে একধরণের নিঃসঙ্গ প্রতিবাদের ভাষা নির্মাণ করেছেন এই ‘একা’ হয়ে যাওয়া মানুষদের পক্ষে। যে ‘একা’ মানুষ মহাবিশ্বের পটভূমিতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রাতিস্বিক বিষাদ সঙ্গী করে, এক ক্ষয়শীল সংঘবদ্ধ অপশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায়।

যে যুদ্ধে ক্রোধ এবং হিংসার লেশমাত্র থাকে না, রক্তপাত ঘটে না— হত্যার উৎসব হয়ে ওঠে না যে যুদ্ধের উৎসার হয়ে জীবনকে বেঁচে থাকার প্রেরণা দেয়—যন্ত্রণাদীন মানুষের অশান্ত হৃদয়ের রক্তপাতক্ষম ক্ষতগুলিতে, নিরাময়ের চিরকল্যাণকামী ‘ভাষার’ প্রলেপ দিয়ে শান্ত, সমাহিতির ভিতর তাকে স্নিগ্ধ, মায়াবী এবং আনন্দময় এক অন্য- জগতের সন্ধান দিয়ে যায়।

জিবরান সারাজীবন নিজেকে এই ‘মায়াময় আনন্দের’ সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। তাঁর সৃষ্টি ‘আনন্দের, আশার, ভালোবাসার’ পবিত্রতা অর্জন করে নিয়েছে নিজের বপ্ত-অভিজ্ঞতায়, অভিজ্ঞানের আলোতে - অন্ধকারে। যে অভিজান একজন শিকড়হারানো ‘ডায়াস্পোরিকের’ অভিমানের চিত্রলিপি। জিরবান নিজের ব্যক্তি যন্ত্রণাকে, বারবার স্বদেশ থেকে দূরে থাকার রক্তিম ক্ষতগুলিকে, বিরহের মর্মন্তদ নিঃসঙ্গতাকে, চ্যুত-মুকুলের মতো পাপড়ির ঝরা প্রেমের ধূসর হয়ে যাওয়া অনিবার্যতাকে, বারবার অতিক্রম করে যেতে চেয়েছেন। স্বীকার করে নিয়েছেন ‘বন্ধনের’ জটিল নিগড়; জীবনদেবতার প্রতি তীব্র বিশ্বাসবোধ যে ‘বন্ধনকে’ মুক্তির চিরন্তন আলায় বিভাসিত করে। সেই ঐশী আলো জিবরানের রচনায় সর্বত্র স্নিগ্ধতার স্পর্শ নিয়ে জেগে থাকে — “তোমার বেদনা, তোমার সহানুভূতিকে যে আবৃত ক’রে রেখেছে, সেই আবরণকে খুলে ফেলো। এমনিভাবে বেদনাকে অনুভব করলে, তা আনন্দেরই এক রূপান্তর ব’লে অনুভূত হবে। এটি হ’ল বীজের আনন্দের মত, যা বৃক্ষের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে শুষ্ক হচ্ছে আবার যা চারা থেকে বৃহৎ মহীরূহে রূপান্তরিত হচ্ছে। যদি বেদনা ও আনন্দ অভিন্ন হয় তবে জীবন ও মৃত্যু অভিন্ন। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কিছুরই মৃত্যু, শুধু সীমিত বস্তু ছাড়া এবং সব সীমিত বস্তুই অসীমের রূপান্তর ও অংশ।”

।। দুই ।।

১৯১৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় জিবরানে ইংরাজি ভাষায় রচিত প্রথম রচনা- সংকলন ‘দি ম্যাডম্যান’। এর আগে আরবি ভাষায় গুটিকয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর লেখা গ্রন্থ ‘মিউজিক’ যখন বই আকারে বের হয়, তখন জিবরানের বয়স মাত্র বাইশ বৎসর। একটু গভীর অভিনিবেশ দিয়ে লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই প্রথম রচনাটির ভিতরে পরবর্তী সময়ের অবিস্মরণীয় গ্রন্থ ‘দ্য প্রফেট’ -এর বীজ সুপ্ত ছিল। ‘মিউজিক’ প্রকাশের পর অবধি ভাষায় লেখা যে চারটি গ্রন্থ পরপর প্রকাশিত হয়, তাদের রচনার সময়সীমা ১৯০৭ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত বিস্তৃত।

১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে ছাপা হ’ল দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘নিমফস্ অব দ্য ভ্যালি’ (উপত্যকার পরীরা)। তিনটি ছোটগল্পের সংগ্রহ এই গ্রন্থটির বিষয় বর্ণিত হয়েছে রূপকের প্রচ্ছায়ার আড়ালে। দক্ষিণ লেবাননের পটভূমিতে কাহিনীত্রয়ের সূচনা হয়েছে। কাহিনী তিনটি যথাক্রমে — ‘মার্থা’,, ‘উন্মাদ জোহান’ এবং ‘ডাস্ট অব এজেস এণ্ড দ্য ইন্টারনাল ফায়ার’। ছোটগল্পের রূপকের আড়ালে যে - সব বিষয় জিবরান লিখতে চাইলেন — তার ভিতর দিয়ে উঠে এলো শরীরকেন্দ্রিক যৌনতা, ধর্মীয় - নিগ্রহ, পুনর্জন্মের কথা এবং প্রত্যাদৃষ্ট প্রণয়। গল্পের ভিতরে ছড়িয়ে রয়েছে জন্মভূমি ‘বিসারিতে’ শৈশবে শোনা অতীতের লোককথা, ‘বাইবেল’ গ্রন্থের প্রতি তাঁর ব্যক্তি - প্রতিস্বরে অনুরাগ, অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তা এবং প্রেম সম্পর্কে অনুভব। পরবর্তীকালে প্রকাশিত ‘উন্মাদ’ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর বীজধার হয়ে উঠেছে জিবরানের আরবি ভাষায় রচিত প্রথম জীবনের লেখাগুলি। প্রথম জীবনে লেখা এইসব রচনার তীব্র ব্যজস্তুতি, কাহিনী - বাস্তবতা, প্রবাসে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হওয়ার বেদনা এবং প্রথানুগ ধর্মের বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর পরবর্তী কালে আরও গভীর এবং লক্ষ্যভেদী হয়ে উঠেছিল। জিবরানের রচনার অভিঘাত ঐতিহ্যানুসারি আরব সাহিত্যের ইতিহাসের একটি স্বতন্ত্র, ভিন্ন স্বাদের সম্পূর্ণ অন্য ধরণের মাত্রা নিয়ে আসে।

প্রথাগত ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ জিবরানের রচনার প্রধান অন্বিষ্ট। প্রকাশিত তৃতীয় গ্রন্থ ‘স্পিরিট রিবেলিয়াস’— সেই তীব্র কণ্ঠস্বরের অনন্য দ্যোতক। এই কাহিনীর নায়ক ধর্মের গোঁড়ামি থেকে মুক্ত, নিরীশ্বরবাদী এবং অন্ধ-অনুগত্যকে প্রবল ঘৃণা করেন। এক তুষার ঝড় ধ্বস্ত শীতরাত্রে মাউন্ট লেবাননের যাজককুল তাকে আশ্রয়চ্যুত হতে বাধ্য করে। পরিত্যক্ত, বিতাড়িত নায়ক আশ্রয় পেল নির্জন পল্লীবাসিনী দুই রমনীর কুটিরে। মা এবং মেয়ে ওই দুই পল্লী - রমনীকে সঙ্গী করে শুরু হয় তাঁর ধর্ম - বিরোধী অভিযাত্রা। যাজকদের স্বার্থে স্থানীয় ভুস্বামী তাকে ধর্মবিরোধী এবং পলাতক অপরাধী হিসেবে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। এই বিচার - প্রহসনের সুযোগ গ্রহণ করে নায়ক আত্মপক্ষ সমর্থনে যে বক্তব্য রাখেন, তার ফলে ভুস্বামী এবং যাজকদের বিরুদ্ধে এক গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হয়।

ঘটনার অভিঘাতে ভুস্বামী আত্মহত্যা করে এবং যাজকেরা এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। নায়কের সাথে আশ্রয়দাত্রী বিধবার কন্যার পরিণয়ের মধ্য দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

'স্পিরিট রিবেলিয়াস' -এর যে কাহিনী এবং তার প্রধান চরিত্রটি পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'নিমফস্ অব দ্য ভ্যালি' -র দ্বিতীয় কাহিনী 'উন্মাদ জোহানা'র প্রতি স্বর। জোহানও বিদ্রোহী, চার্চের অমানবিক আচারণের বিরুদ্ধে দৃপ্তকণ্ঠ। তার পালিত পশুটিকে অন্যায়ভাবে, মঠের যাজকেরা চার্চের খোঁয়াড়ে বন্দী করে রাখে। যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষদের সচেতন করে তুলতে চান জোহানা। স্পষ্ট উচ্চারণে সে আহ্বান জানায়—দরিদ্রের, বঞ্চিতের, অপমানিতের খ্রিষ্টকে— যে খ্রিষ্ট পুনর্জন্ম নিয়ে আবার ফিরে আসবেন মাটির পৃথিবীতে। যিনি ধর্ম - ব্যবসায়ীদের তাড়িয়ে দেবেন চার্চের সীমানার বাইরে, যে ধর্ম - ব্যবসায়ীরা কলুষিত করেছে পুজা - অঙ্গনকে, খ্রিষ্টের ভাবমূর্তিকে, মানবিকতার উজ্জ্বল ঐতিহ্যকে। 'এরাই তেমার পবিত্র মন্দিরকে নরককুণ্ড বানিয়েছে, যেখানে এখন বিষাক্ত সর্পকুণ্ডলী পাকিয়ে অপেক্ষা করেছে, চোবল মারার অভিপ্রায়।'

যাজকেরা প্রতিবাদী জোহানাকে বিচারের জন্য অপরাধীর কাঠগোড়ায় তোলে এবং মস্তিষ্কবিকৃতির দোহাই দিয়ে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়। 'স্পিরিট রিবেলিয়াস' কাহিনীর সুখি পরিণতি জোহানার ভাগ্যে জোটেনি। কিন্তু দু'জনেই একটি স্থবির সমাজ কাঠামোর ভিতর থেকে বাস্তবতার বিরুদ্ধে আঘাত গড়ে তুলতে চেয়েছে। প্রথম থেকে জিবরানের রচনায় যে সমাজ-বাস্তবতার অভিঘাত স্পষ্ট ধরা পড়তে থাকে তা হল– সামন্ততন্ত্র এবং ধর্মীয়গোষ্ঠীতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা, স্বাধীনতার জন্য তৃষ্ণার্তের প্রবল আর্তি, নারী স্বীকারের প্রশ্নে নিঃসংকোচ সমর্থন এবং বিষয়বস্তুর বলিষ্ঠ নির্মাণ - কল্পনা। আসলে তাঁর মনন জগতে এই জাতীয় একটি বিশ্বাসবোধ তথা ধারণা গড়ে উঠেছিল, ব্যক্তিগত জীবনের তিক্ত বিধুর যাপনের নিরিখে। বান্ধবী এবং প্রেমিকা মেরি হাস্কেলকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন— তাঁর এইসব রচনার প্রেক্ষিত তৈরি হয়েছিলো জীবনের নিঃসঙ্গতা, মৃত্যুচেতনা, অসুস্থতা এবং প্রেমহীনতার আবহরূপে। প্রবাসী জীবন আরেক ধরণের ক্ষত করেছিল তাঁর হৃদয়ে, বারবার ফিরতে চেয়েছেন দক্ষিণ - লেবাননের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের মধ্যে, ছেড়ে যাওয়া নির্জনগ্রাম 'বিসরিতে'। কিন্তু যেভাবে তিনি দেশ ছেড়েছেন, ঠিক সেভাবে কোনদিন আর স্বদেশের মাটিতে ফিরতে পারেননি। এই জাতীয় ধর্মদ্রোহী এবং প্রথাবিরুদ্ধ রচনার জন্য সিরিয়ান চার্চের সঙ্গে আমৃত্যুকাল তাঁর এক প্রত্যাখ্যান - জনিত বিচ্ছেদভূমি তৈরি হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা জরুরি, যাজক- তন্ত্র বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে 'স্পিরিট রিবেলিয়াস' গ্রন্থটিও সিরিয়ান শাসকদের রোষদৃষ্টিতে পড়ে এবং সরকার কর্তৃক 'সেন্সারড' হয়। তবুও একথাও সমানভাবে স্মর্তব্য যে আরবি ভাষার পাঠকদের কাছে এবং এর আগে এই জাতীয় স্পর্ধিত, বিপ্রতীপ মেরুর রচনাপাঠের অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে জিবরাণের লেখার প্রতি কৌতুহল যেমন এক শ্রেণির আরব ভাষাভাষির মধ্যে জেগে ওঠে, অন্যদিকে তাঁর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি জনিত যে প্রথাবিরুদ্ধতা তথা ধর্মদ্রোহীতা, তাও তৎকালীন সিরিয়ার রাজনৈতিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মনে এক আপোষহীন নবীন মনোভঙ্গির জমি তৈরি করে দেয়। ফলে একই সঙ্গে চার্চ এবং রাষ্ট্র এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে খলিল জিবরানের বৈরিতার ইতিহাস ধীরে ধীরে শিকড় ছড়ায়। পরবর্তী সময় জিবরান তাঁর সৃজন জগতের বাইরেও নানাভাবে এই বৈরিতার আবহকে প্রসারিত করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি জিবরানের বিদ্রোহীসত্তার এক নতুন বিন্যাস গড়ে দেয়। জিবরানের লেখা ক্রমশঃ আরব জনতার কণ্ঠস্বর হয়ে উঠতে থাকে এবং ব্যক্তি - জিবরান, নতুন শতাব্দীর আরবসাহিত্যের অন্যতম প্রতিভূ হয়ে ওঠেন।

।। তিন ।।

জিবরানের বাবা ছিলেন নির্দায়-মদ্যপ, জুয়াড়ি, খড়কুটোর মতো ভেসে যাওয়া এক লেবানিজ্। খলিলের জন্মের পর, পিতার হৃদয়ে যে আনন্দের উৎসার, তা তিনি উদ্যাপন করেছিলেন মদ্যপানের মাধ্যমে। এ-হেন পিতার সন্তান, তার যে শৈশব, তা দুঃখ মথিত ক্ষুধাজর্জর হবে সে ব্যাপারে কোন দ্বিমত থাকা উচিত নয়।

কিন্তু মা কামিলা ছিলেন ম্যারোনাইট ক্যাথলিক গির্জার যাজক ফাদার ইস্তিয়ান রাহেমির কন্যা। জিবরানের পিতা, কামিলার দ্বিতীয় স্বামী। কালিমার প্রথম স্বামী হান্না আবদাস সালাম কর্মসূত্রে দক্ষিণ - আমেরিকার ব্রাজিলে পাড়ি দেন। স্ত্রী কালিমা তার সঙ্গিনী হন। প্রথম বিবাহের ফলে জন্মায় খলিলের সৎ - বড়দাদা পিটার— যার বাড়ির নাম ছিল বুত্রো। খলিল ছাড়াও কামিলার দ্বিতীয় বিবাহের ফসল আরও দুটি কন্যাসন্তান, সুলতানা আর মারিয়ানা।

খলিলের বয়স যখন আট বছর, অর্থনৈতিক অপরাধের দায়ে তাঁর বাবা জেলে যেতে বাধ্য হন। অটোমান কর্তৃপক্ষ খলিলদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এবং জিবরান পরিবার সম্পদহীন, গৃহহীন, দরিদ্রে পরিণত হয়। কিছুকাল নিকট আত্মীয়দের আশ্রয়ে তাদের দিন কাটে, কিন্তু কালিমা ছিলেন স্বামীর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। এই অদম্য ইচ্ছাশক্তি তিনি ধর্মীয় ঐতিহ্যের সূত্রে অর্জন করেছিলেন। সুতরাং পরাশ্রয়ে, পরান্নে নির্ভর করে কামিলা দিন পার করতে চাইলেন না।

জিবরানের এক সম্পর্কিত কাকা ইতিমধ্যে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছেন। তাঁর পথ অনুসরণ করলেন কামিলা। সন্তানদের নিয়ে কামিলা ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জুন লেবানন ত্যাগ করে, সমুদ্রপথে পাড়ি দিলেন আমেরিকার উদ্দেশ্যে। জিবরান পরিবারের সমুদ্রযাত্রা এসে শেষ হল নিউইয়র্কের জাহাজঘাটায়। জিবরান পরিবার প্রথম আশ্রয় খুঁজে নিলেন বস্টন শহরের দক্ষিণ অংশে। এটা সেই সময় যখন দ্বিতীয়বার দলে দলে সিরিয়ান দেশত্যাগীদের ভীড় এসে পৌঁছাচ্ছে নিউইয়র্ক শহরে।

কামিলার কাঁধে চাপলো সমগ্র পরিবারের অর্থনৈতিক দায়। প্রবাসী জীবনে, কিন্তু সামান্যও ভেঙে পড়লেন না সেই নিয়তি কশাঘাত জর্জর লেবানিজ রমণী। শুরু করলেন দক্ষিণ বস্টনের রাস্তায় ঘুরে ভ্রাম্যমান ফেরিওয়ালার জীবন। সে সময় বেশির ভাগ অনাবাসী সিরিয়ানদের কাছে জীবনযাপনের অন্যতম পেশা হয়ে উঠেছিলো ফেরিওয়ালাবৃত্তি। তাছাড়া এইসব দেশচ্যুত জনজাতির জীবনযাপনের প্রাচ্যধারা— যা অলস এবং মন্থর, তার সাথে ভ্রমণ-শীল ফেরিওয়ালার পেশাটি বেশ মানিয়ে গিয়েছিল।

তবু বলতে হয় শৈশব - কৈশোর জিবরানের আনন্দে কাটেনি। দারিদ্র, রুগ্নতা, মৃত্যু এই তিনটি বিন্দু সারা জীবন তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করে রেখেছিল। বিশেষত বস্টন শহরে তাঁদের আশ্রয় স্থল 'চায়না টাউনের' নোংরা বস্তির যে পরিবেশ, তা অপ্রাকৃত দুঃস্বপ্নের মতো সারাজীবন বহন করেছেন তিনি। স্মৃতিতে উজ্জ্বল ছুরির মতো জ্বলে থাকলো 'পরীদের আশ্চর্য উপত্যকা', লীডার মহীরুহের ছায়াঢাকা লেবানীজ - গ্রাম আর বাস্তবের দুনিয়ায় অপরিষ্কৃত পথ ঘাট, আবর্জনায় জমে ওঠা স্তূপ, শ্বাসরোধী দুর্গন্ধবহ বাতাস দিয়ে ঘেরা, স্বর্ণোজ্জ্বল মহাদেশের প্রান্তিক রাজ্য ম্যাসাচুসেটের বস্টন শহরের 'চায়না-টাউন'। পরিবেশগত অসহায়তা এরপর থেকে জিবরানের সারা সময়ের সঙ্গী। আর সেই অসহায় বেদনাভারকে তিনি ভুলে যেতে চেয়েছেন, শিল্পের অতলে ডুব দিয়ে। ফিরে যেতে চেয়েছেন স্বদেশে, লেবাননের মৃত্তিকার গভীরে শ্বাস নিতে চেয়েছেন।

বস্টনে অনাবাসী দরিদ্র পরিবারের শিশুরা প্রায়শ বিদ্যালয়ের দরজা পর্যন্ত যেতে পারতো না। জিবরানের দুই বোনও শিক্ষার

সুযোগ পায়নি। দারিদ্র ছাড়া এর অন্য একটি কারণ সামাজিক সংস্কার। মধ্যপ্রাচ্যের মেয়েদের, কী খৃষ্টান অথবা মুসলমান দুই গোষ্ঠীই প্রথামাফিক শিক্ষাগ্রহণের যোগ্য বলে ভাবতে শেখেনি। নারীদের স্থানাংক ছিল এই পশ্চাৎপদ সমাজে অর্ধ - মানবের মতো। জিবরানের ভাগ্য কিন্তু তাঁকে স্কুলের ভিতরে পৌঁছে দিয়েছিল।

১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর, ঠিক স্বদেশ ছেড়ে আসার দুটি মাস পরে জিবরান বস্টনের ইস্কুলে ভর্তি হন। আগে কোন রূপ স্কুল শিক্ষা না তাকার জন্য তাকে অনাবাসী শিশুদের নিম্নতম ক্লাসে ভর্তি করা হয়। লেবাননে বাল্যকাল থেকে ছবি আঁকার যে প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল, তা এখানের শিক্ষকদের চোখে ধরা পড়ে। জিবরানের অসাধারণত্ব তখন থেকে চিহ্নিত হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে ফেরিওয়ালার পেশায় এবং কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে সংসারে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। কালিমার হাতে সঞ্চয়জনিত কারণে কিছু অর্থও জমে উঠেছে। তা দিয়ে খলিলের বড়দা বুত্রো একটা ছোট্ট দোকান চালু করে এবং দুই বোন সেই ছোট্ট দোকানে বুত্রোকে সাহায্য করার কাজে নিয়োজিত হয়। খলিলকে কিন্তু সংসারের এই অর্থনীতির দায় সামলাতে হয় নি। বরং সে সময়টা সে ঘুরে বেরিয়েছে থিয়েটার হলে, অপেরা হাউসে এবং শহরের চিত্রকলার গ্যালারিগুলোতে। আগেই বলা হয়েছে, পাবলিক স্কুলের শিক্ষকদের কাছে জিবরানের ছবি, রেখাচিত্র ইতিমধ্যে তাঁকে একধরণের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তাঁর সে সময়ের শিক্ষকদের কেউ কেউ তাঁর মধ্যে একজন ভবিষ্যতের শিল্পীর উপস্থিতি টের পেয়েছিলেন।

১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ফের বেইরুটে ফিরে এলেন জিবরান। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে একদিন চিত্রকর ফ্রেড হল্যান্ড জিবরানের চোখের সামনে উন্মোচিত করে দিলেন চিত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ পৃথিবী। ক্রমে ক্রমে বিদেশের মাটিতে শিকড় ছড়ালো তাঁর শিল্পসত্তা। ঠিব এইসময় তিনি ফিরতে চাইলেন লেবাননে, উদ্দেশ্য— তাঁর লেবাননের ছেড়ে যাওয়া পাঠক্রম শেষ করা এবং ভালোভাবে আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা। তখন পর্যন্ত জিবরান ইংরেজি এবং আরবি দুটো ভাষা খুব ভালোভাবে জানতেন না। আরবিতে কথা বলতে পারতেন স্বতস্ফূর্তভাবে অথচ লিখতে কিংবা পড়তে কোনটাই পারতেন না। ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে লেবাননের পড়ার পাঠ শেষ হল তাঁর, ইতিমধ্যে শিখেছেন ইংরাজি, আরবি ছাড়াও ফরাসীভাষা।

সংসারে এরমদ্যে হানা দিয়েছে মৃত্যু। বোন সুলতানা মারা গেলেন ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ এপ্রিল। দীর্ঘকাল যক্ষায় ভুগছিলেন তিনি, মা কামিলাও অসুস্থ, ক্যান্সার মারণরোগ হয়ে বাসা বেঁধেছে তাঁর শরীরে। লেবানন থেকে ফেরার আগেই সুলতানার মৃত্যু, জিবরান বোনের মুখ আর দেখতে পেলেন না। ঐ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে কামিলার ক্যান্সার জনিত টিউমার অপারেশনের মাধ্যমে অপসারিত করা হল। মনের দিক থেকে সায় না পেলেও জিবরান জোর করে পরিবারের ব্যবসা এবং অর্থনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে দিতে চাইলেন। সৎ দাদা বুত্রো ইতিমধ্যে বস্টন ছেড়ে ভাগ্যের খোঁজে পাড়ি জমিয়েছে ক্যুবার দিকে। পরের বছর ২৮ জুন মা মারা গেলেন, জিবরান দেখলেন মৃত মায়ের কষ বেয়ে নেমে আসছে রক্তের শীর্ণধারা। এই দু'দুটি মৃত্যু জিবরানের জীবনকে আমূল বদলে দিয়ে যায়। ফের তিনি ফিরতে চান শিল্পের কাছে, মানবী প্রেমের কাছে। তাঁর জীবনে বারবার ভাঙ্গনের মুখে বড় হয়ে উঠেছে বালবাসার গভীর আকর্ষণ, যে আকর্ষণ মৃত্যুকে অবহেলায় অস্বীকার করে। ভাঙ্গাচোরা জীবনকে শুকনো মরুপথে একা একা অনেক দূর এগিয়ে দিতে পারে।

।। চার ।।

জিবরানের জীবনে নারীদের ভূমিকা একটি অচ্ছেদ্য বন্ধনের মতো। কৈশোরে বস্টনের এক ধনী রমনীর সঙ্গে পরিচয়ের নিবিড়তা তাঁকে প্রথম যৌনতার স্বাদ দিয়েছিল। পরবর্তী কালে মেরি হ্যাসকেল, মিচেলিন, মে জিয়াদা — একের পর এক রমনী তাঁর জীবনে এসেছে। মেরি হ্যাসকেল জিবরানকে জিবরান হয়ে উঠতে যে প্রেমের হাত প্রসারিত করেছে, সাহিত্যের ইতিহাসের তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। সেই মেরিও সাভানাবাসী তাঁর এক নিকট আত্মীয়কে বিয়ে করে জিবরানের জীবন থেকে সরে যান। মেরি হ্যাসকেল খালিলের চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড়, তবু প্রাণের সংরাগে তিনি ভরে দিয়েছিলেন জিবরানের প্রবাসী জীবনের শূন্যতা, নিঃসঙ্গতা।

মিচেলিনকে জিবরান খুঁজে পান মেরির্ ইস্কুলের মধ্যে। মোয়াজ্জেল এমিলি মিচেল, মেরীর স্কুলের একজন শিক্ষিকা। আলাপের সূত্রে খলিল কয়েকদিনের মধ্যে পৌঁছে চান মিচেলিনের হৃদয়ের গভীর অন্তঃস্থলে। মেরী হ্যাসকেল শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনে খালিলকে প্যারিতে পাঠালেন। প্রতিমাসে ব্যয়জনিত খরচ পঁচাত্তর ডলার মেরী স্বেচ্ছায় বহন করতে থাকেন। সে - পর্যন্ত জিবরানের আরবি ভাষায় মাত্র তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া আর সম্বল কিছু নেই।

প্যারিতে ভাস্কর রঁদ্যার সাথে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। রঁদ্যার কাছে জানতে পারেন, ইংরেজি ভাষার কবি ও চিত্রী উইলিয়াম ব্লেকের কথা। একদিন রাস্তায়, বইয়ের দোকান থেকে সংগ্রহ করে আনেন ব্লেকের একখণ্ড কবিতার বই। পার্কের নির্জনতায় শুষে নিতে চাইলেন ব্লেকের কাব্যের দুরান্ত নি: সীমতা। বাড়ি ফিরে সারা সময় তাঁর সত্তা আচ্ছন্ন করে রাখলো ব্লেক।

এসময় মিচেলিন এসে উপস্থিত জিবরানের অদম্য টানে তাঁর প্যারি আস্তানায়। স্বপ্নের মতো মিচেলিনকে সহসা চোখের সামনে দেখে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন জিবরান। কিন্তু হৃদয় মিলে গেলেও, এই প্যারিতেই মিচেলিনের আত্মার সঙ্গে নিজেকে মেশাতে পারলেন না তিনি। তাঁর জীবন থেকে চিরকালের মত সরে যায় মিচেলিন। জিবরান আটকাতে পারেন নি তাকে। কিন্তু ভেবেছিলেন আবার ফিরে আসবে মিচেলিন। কিন্তু না, জিবারানের জীবনে আর মিচেলিনের জন্য কোনও স্মৃতি নতুন করে তৈরি হয় না। তারপর পৃথিবীর জন্য অরণ্যে কোথায় হারিয়ে গেল মিচেলিন।

১৯১২ সালে মে জিয়াদার সঙ্গে জিবরানের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। জন্মসূত্রে মে মিশরের বাসিন্দা। মে জিয়াদার অন্যতম পরিচয় তিনিও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত, বিশেষত সমালোচনা - সাহিত্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা ইতিমধ্যে মিশরি সাহিত্যে তাঁর স্থান অনিবার্য করেছিল। আশ্চর্য রূপসী ছিলেন মে জিয়াদা।

সারাজীবন পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে দূরে ছিলেন। দেখা হয়নি একবারের জন্যও। কিন্তু অজস্র চিঠির ভিতর ধরা পড়েছে দুজনের হৃদয়। বিশ শতাব্দিতে যখন শরীর ছাড়া প্রেমের অভিজ্ঞানে মানুষ ঘোর অবিশ্বাসী, এমন যৌনসর্বস্ব যুগে মে জিযাদা আর খলিল জিবরানের প্রেমের ইতিবৃত্ত আশ্চর্য মাত্র নয়, অলৌকিকও। ড. কালিম জাবরে তাঁর গদ্যগ্রন্থ 'মে ও জিবরান' -এ লিখেছেন, —'একথা চিন্তা করাও কঠিন যে, নরনারী উভয়কে মুখোমুখি না দেখে, পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে না পেয়ে শুধু পত্রের মাধ্যমে এমন গভীর প্রেমে পড়তে পারে, এটা শুধু বিচিত্র নয় অচিন্তনীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না।' জিবরানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আত্মার নর্ম - সহচর এবং জিবরান - সাহিত্যের নিবিড় ব্যাখ্যাত্যা মিখাইল নায়েমি জানিয়েছেন, — মে জিয়াদা সমাজে ধনী শ্রেণীর মানুষ ছিলেন না। জিবরানের কাছে আমেরিকায় আসার মত অর্থসংগতি তাঁর ছিল না।

মেরি হ্যাসকেল দীর্ঘদিন তন্নিষ্ঠ প্রেমিকার মতো লালন করেছেন খালিলকে। জিবরানের ইংরাজি ভাষার লেখার মান উন্নয়নে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছেন। আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন, যাতে জিবরানের শিল্পীসত্তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। চিত্রকর এবং কবি - দুই জিবরান পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে যেতে পারেন। নারীদের সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য সম্পর্ক এবং যোগসূত্রের সামাজিক অন্বয়কে জিবরান কখনো অস্বীকার করেননি। তাঁর লেখায় নারীর প্রতি বিশ্বাস অমলিন। যদিও তাঁর জীবনে জার্মান দার্শনিক নীৎসে নীৎসের প্রভাব একদা অপরিসীম ছিল, যে নিৎসে নারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠায় ঘোর অবিশ্বাসী ছিলেন। যিনি লিখেছিলেন, ‘আদর্শ পুরুষ অপেক্ষা আদর্শ নারী মানবজাতির এক উচ্চতর স্তরের বিকাশ, আর এ বস্তুটি তদ্‌পেক্ষাও বেশি দুর্লভ।’

কিন্তু নীৎসে - দর্শনের গভীর অনুরাগী খলিল জিবরান ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে মে জিয়াদাকে লেখা একটি চিঠিতে নিঃসংকোচে জানিয়েছেন, ‘আজ আমাকে যে ‘আমি বলতে পারছি তার জন্য আমার নারীদের কাছে শৈশব থেকে ঋণের অন্ত নেই। নারীই আমার চোখের দৃষ্টি খুলে দিয়েছে, হৃদয়ের দরজা খুলে দিয়েছে। যদি না নারী রূপে মাতা, ভগ্নী ও বান্ধবী থাকত তাহলে আমাকে এই পৃথিবীতে নিবিড় নীরবতায় থাকতে হত, সেখানেই আমি থাকতাম।... ‘নারীকে কোনদিন ভুলে থাকতে পারেননি জিবরান। তাঁর সমস্ত সত্তা জুড়ে ছিল মানুষীদের গভীর সংরাগ। আমৃত্যুকাল সেই প্রেমের অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা গোপনে বহন করেছেন তিনি। বিরহ তাঁর জীবনে এক নিমর্ম নিয়তির মতো। দয়িতার সঙ্গে বাস্তব জীবনে তাঁর মিলন ঘটেনি, এজন্য তাঁর দগ্ধতা ছিল, ব্যথা ছিল, নির্জনে ঝরতে থাকা হৃদয়ের শব্দহীন রক্তক্ষরণ ছিল কিন্তু এই অপ্রাপ্তির বেদনা তাঁকে বিকৃতির উপাসকে পরিণত করে নি। বাস্তব জীবনের ব্যর্থতা তিনি ঢেকে দিতে চেয়েছেন ঐশী প্রেমের আবেগঘন আহ্বানে। জীবন এবং মানবিকতাকে একসূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছেন শিল্প রচনার মাধ্যমে। ‘দ্য প্রফেট’ সেই সৃজনপ্রক্রিয়ার একটি উচ্চতম শিখরদেশ। যে উচ্চতায় পৌঁছাতে হ’লে হয়ত মানুষকে একা, পরিত্যক্ত, নিঃসঙ্গ হয়ে যেতে হয়। কিন্তু সেই গভীর নিঃসঙ্গতার ভেতর সেই মানুষটি অনিবার্য বাজিয়ে যেতে পারে মানবিক - সংযোগের আশ্চর্য বীণাটিকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতমুখ এবং মৃত্যুদীর্ণ - বৃ,গুল ‘দ্য প্রফেটের’ জন্মকোষ। ‘দ্য প্রফেট’ -এর গঠন শৈলী অনেকটা যেন ‘দাস্ স্পীক জরাথুস্ট্র’-র মতো। কিন্তু এই গ্রন্থের বিষয়সীমায় নীৎসে নেই। বরং ‘প্রফেট’ -এর ছত্রে ছত্রে যে প্র্যাচ্যের সুরভি জড়িয়ে আছে। আল - মুস্তাফা এসে দাঁড়িয়েছেন সমুদ্রতটে। দীর্ঘদিনের প্রবাসভূমি আলফালেজ ত্যাগ করে তিনি ফিরে যাবেন স্বদেশে। পর্বতচূড়া থেকে দেখা যায় জাহাজের মাস্তুল। যে জাহাজ আল - মুস্তাফাকে জন্মদেশে ফিরে নিয়ে যাবে। সাগরবেলায় দলে দলে এসে জমা হচ্ছে নগরীর বাসিন্দারা। জ্ঞানী - অজ্ঞানী, পুরুষ - নারী, বণিক - শ্রমিক, বিচারক - বিচারপ্রার্থী, নির্বিশেষে। বিদায়ী আল মুস্তাফার কাছে তারা জানতে চায় জীবনের অর্থ। বেঁচে থাকার মানে। কী ভাবে তারা পথ চলবে সেই অমোঘ নির্দেশ। একে একে প্রশ্ন নিয়ে তারা মুস্তাফার সামনে এসে বিনীতভাবে দাঁড়ায়। আল মুস্তাফা তাদের নিজের অভিজ্ঞতাজারিত সঞ্চয় দিয়ে ঋদ্ধ করতে চান। ‘দ্য প্রফেট’ এই সংশয়তাড়িত প্রশ্ন আর সংকোচহীন উদাত্ত উত্তর - পর্বের সমাহার। দু’টি বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী য়ুরোপে, বিশেষতমার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে— হাজার হাজার পাঠক এই কৃশতনু গ্রন্থটির ভিতরে খুঁজে পেয়েছেন বাঁচার, যাপনের, সময় - অতিবাহনের আলোময় সংকেত। ‘প্রফেট আল মুস্তাফার কাছে আমরা জেনে নিতে পারি একটি এমন তত্ত্ব, যা জীবন সম্পর্কে এযাবৎ সমস্ত দর্শনের সারাৎসার। ‘জীবন এক এবং অনন্ত’। নদী প্রবাহের মতো চৈতন্যময় মানবজীবন। যা নশ্বর হয়েও প্রতিনিয়ত অবিনশ্বরতার দিকে চলে যেতে চায়।

।। পাঁচ।।

‘নিহত ব্যক্তি হত্যার জন্য নিজেও দায়ী,
লুণ্ঠিত ব্যক্তিও লুণ্ঠিত হবার জন্য দোষণীয়
দুরাত্মার অপকর্মের জন্য ধার্মিকও দায়মুক্ত নন,
অপরাধীর কার্যকলাপের জন্য ধার্মিকও দায়মুক্ত নয়’

১৯৩১ সালের ১০ এপ্রিল। শুক্রবার । মিখাইল নায়েমি তখন অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে। টেলিফোনে খবর পেলেন। খলিল জিবরান ভিনসেন্ট হাসপাতালে। ৯ এপ্রিস সন্ধ্যায় নিজের স্টুডিওতে অসুস্থ হয়ে পড়েন জিবরান। সেদিন স্থানীয় চিকিৎসক এলেও বেশি কিছু করা সম্ভব হয়নি। পরদিন সকাল দশটায় পর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। নায়েমী যখন হাসপাতালে পৌঁছালেন, জিবরান তখন ‘কোমার’ গভীরে চলে গেছেন। ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে আসছিলো শরীর। ‘লিভার ক্যানসারের’ শেষ পর্যায়। নায়েমী অন্তিম - শয্যার পাশে। নীরবে দেখছেন জ্ঞানলুপ্ত ‘বিদ্রোহী’ মানুষটির মৃত্যুর বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রাম।

মৃত্যুর পরও বিতর্ক তাঁর পিছু ছাড়েনি। মরদেহ নিউইয়র্ক থেকে বস্টনে নিয়ে যেতে হবে, প্রয়োজন একজন ম্যারোনাইট ক্যাথলিক যাজকের শংসাপত্র। এক প্রভাবশালী সাংবাদিক সেই সার্টিফিকেটের বন্দোবস্ত করলেন।

জিবরান চেয়েছিলেন তাঁর মৃত শরীর যেন লেবাননের মৃত্তিকার গভীরে শেষ আশ্রয় নিতে পারে। সেই মতো ২১ আগস্ট, তাঁর শবদেহ বেইরুট বন্দরে নিয়ে আসা হল। অবশেষে ‘বিসারীর’ আকাশের নীচে, ‘পরীদের স্বপ্নময় উপত্যকার’ নিবিড়ে ঘুমিয়ে রইলেন অশান্ত - হৃদয় লেবানিজ।

একদা তিনি যে জেয়াদাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘আমি যে একটা মেঘ, যে সব কিছুকেই স্পর্শ করে যায়, কিন্তু কারুর সঙ্গে মিশে যায় না। আমি একা সলিল - মরুতের সন্নিপাত; আমার একাকীত্ব, আমার নিঃসঙ্গতা, আমার ক্ষুধা, আমার তৃষ্ণা ঐ মেঘেই। আমার বিপদও ঐ মেঘে, সেটি আমার বাস্তব; উৎকর্ণ হয়ে আছে শুনবার জন্য—তুমি এই বিশ্বে একলা নও, আমি তোমার সঙ্গে আছি; আমি জানি তোমার বাস্তব সত্তা।’

একজন সৎচৈতন্যের শিল্পী— আর কত বেশি নিজস্ব সত্তাকে উন্মোচিত করতে পারেন? মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে অস্তিত্বের ছিঁড়ে যাওয়া শিকড়ে, এভাবে আশার ডানায় উড়াল দিয়ে প্রাণসঞ্চারী জল ছিটিয়ে যেতে পারে ক’জন?